স্বাস্থ্য সংলাপ

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

উইলমস' টিউমার বা নেফ্রোব্লাসটোমা

রোগতত্ত্ব ও চিকিৎসা

মীর এহতেশামুল হক, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা
মোহাম্মদ আফজালুর রহমান, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি, ঢাকা
ফাতেমা খাতুন, আইসিডিডিআর,বি

কিডনী আমাদের দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিডনীর একধরনের ক্যান্সারের নাম উইলমস' টিউমার বা নেফ্রোব্লাসটোমা। এ-রোগের গুরুত্ব আমাদের কাছে অনেক বেশি এজন্য যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ-রোগে আক্রান্ত হয় শিশুরা যাদের আমরা অত্যন্ত ভালোবাসি। এটি একটি মাংসল (solid) টিউমার। শিশুরা ক্যান্সারজাতীয় যেসব রোগে আক্রান্ত হয় তার মধ্যে শতকরা পাঁচ ভাগ এই টিউমারজনিত রোগ। বাংলাদেশে এ-রোগের সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর এ-রোগে নতুনভাবে আক্রান্ত ৬৫০টির মতো রোগী সনাক্ত হয়।

সাধারণত তিন বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে এ-রোগ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের মধ্যেই সমানভাবে এ-রোগ পরিলক্ষিত হয়। ডান অথবা বাম কিডনীতে সমানহারে এ-রোগ দেখা যায়। তবে, শতকরা পাঁচভাগ ক্ষেত্রে এ-রোগ উভয় কিডনী আক্রান্ত করে।

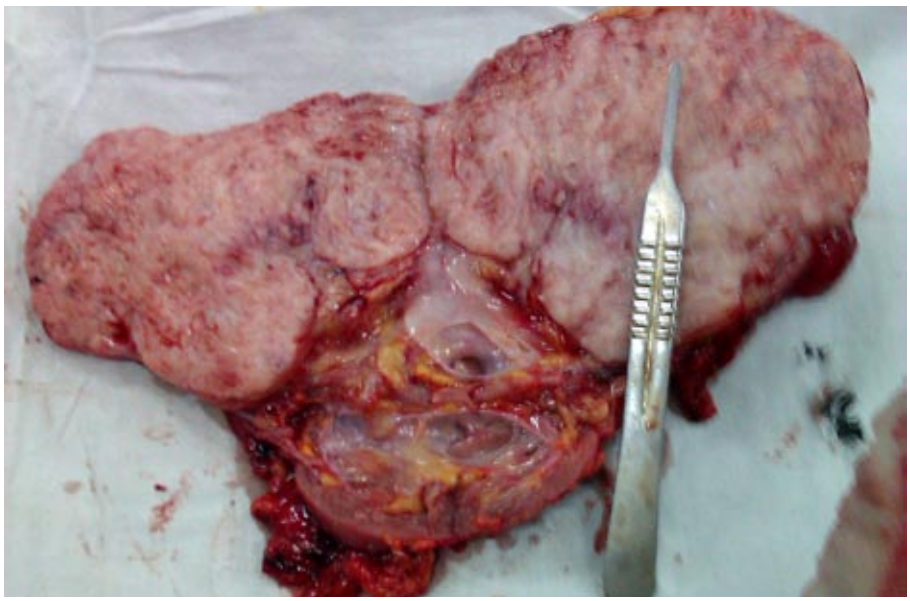

ব্যবচ্ছেদ-করা উইলমস' টিউমার

রোগের কারণ

উইলমস' টিউমার বংশগত কারণে যেমন হতে পারে, তেমনি অন্য কারণেও হতে পারে। শতকরা একভাগ ক্ষেত্রে এটি বংশগত কারণে হয়ে থাকে। এ-রোগে আক্রান্ত শতকরা দশভাগ শিশুর কিছু জন্মগত ত্রুটি, যেমন WAGR syndrome (উইলমস' টিউমারের সাথে চোখের আইরিশের অনুপস্থিতি, যৌনতন্ত্রের বৈকল্য ও মানসিক বৈকল্য) দেখা যায়। আমাদের ১৮ নম্বর ক্রোমোজোম (Trisomy 18)-এর আধিক্য ও কিছু জিনের পরিবর্তনের কারণেও এ-রোগ সৃষ্টি হয়।

১৯৭২ সালে নুডসন ও স্ট্রং (Knudson and Strong) প্রদত্ত মতবাদ এ-রোগের কারণ বর্ণনা করে। তাদের মতবাদ অনুসারে উইলমস' টিউমার জিন (WT gene) এ-রোগের উৎপত্তির কারণ। এটি আমাদের দেহের ১১ নম্বর ক্রোমোজোমে অবস্থান করে এবং স্বাভাবিক জিনের দু'বার পরিবর্তনের কারণে উইলমস' টিউমার জিনের উৎপত্তি হয়।

উইলমস' টিউমারের উৎপত্তিস্থল

লক্ষ লক্ষ নেফ্রোনের সমন্বয়ে আমাদের কিডনী গঠিত হয়। নেফ্রোন হলো কিডনীর একক। সেই নেফ্রোন থেকে উইলমস' টিউমারের উৎপত্তি হয় বলেই এর বৈজ্ঞানিক নাম নেফ্রোব্লাসটোমা (nephroblastoma)। খালি চোখে টিউমারটি গোলাকৃতির এবং হালকা ধূসর বর্ণের বলে প্রতীয়মান হয়। প্রাথমিক অবস্থায় টিউমারটি একটি আবরণী (capsule) দ্বারা আবৃত থাকলেও পরবর্তী কালে বড় হবার সাথে সাথে আবরণী ভেদ করে আশপাশের টিস্যু ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া, লসিকা-নালী ও রক্তের মাধ্যমে ফুসফুস, লিভার, হাড়, এমনকি মস্তিষ্কেও ছড়িয়ে পড়ে। শতকরা ১০-১৫ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে প্রথম রোগ-নির্ণয়ের সময়ই দূরবর্তী অঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। শতকরা ৮৫-৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে ফুসফুসে ও ১০-১৫ ভাগ ক্ষেত্রে যকৃতে এবং শতকরা ২৫ ভাগ ক্ষেত্রে রোগটি নিকটবর্তী লসিকা-গ্রন্থিতে ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে।

রোগের স্তর-বিন্যাস

ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য প্রতিটি ক্যান্সারজাতীয় রোগ-নির্ণয়ের পর রোগটি শরীরে কতদূর বিস্তার লাভ করেছে তা জানা খুবই জরুরি। উইলমস' টিউমারের বিস্তৃতির ওপর ভিত্তি করে রোগের তীব্রতাকে নিম্নবর্ণিত পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। সঠিকভাবে স্তর-বিন্যাস করে সঠিক চিকিৎসা প্রদান পূর্ণভাবে রোগ নিরাময়ের সর্বোচ্চ নিশ্চয়তা দান করে। স্তর যত উপরে হবে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা তত কম।

স্তর ১: এই স্তরে টিউমারটি শুধুমাত্র আক্রান্ত কিডনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে বলে শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে পূর্ণ নিরাময়ের সম্ভাবনা খুব বেশি।

ভেতরের পাতায়

- বড়দের মূত্রনালীর সংক্রমণ: রোগতত্ত্ব ও প্রতিকার
- mv‡qÝ জার্নালে নিপাহ ভাইরাস নিয়ে আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণাকর্মের ওপর ফিচার
- আপনার চারপাশেই জীবাণু: কোনটা শত্রু আর কোনটা বন্ধু চিনে নিন
- রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

বর্ষ ১৯ | সংখ্যা ৩
চৈত্র ১৪১৭ | এপ্রিল ২০১১
ISSN 1021-2078

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস্, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	আলেহান্দ্রো ক্র্যাভিওটো
উপ-প্রধান সম্পাদক	প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	এম শামসুল ইসলাম খান
সম্পাদক	এমএ রহিম

সদস্য

আসেম আনসারী, রুখসানা গাজী, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, মোঃ আনিসুর রহমান ও রুবহানা রকিব

পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান
কম্পোজ	হামিদা আক্তার

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বরাবর ইংরেজিতে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৮৮৬০৫২৩-৩২
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: msik@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: সিদ্দিক প্রিন্টার্স, ঢাকা

স্তর ২: এই স্তরে টিউমারটি কিডনীর আশপাশে ছড়িয়ে পড়লেও শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে পুরোপুরি অপসারণ করা সম্ভব এবং শল্যচিকিৎসার পর কোনো অবশিষ্ট টিউমার রোগীর দেহে থেকে যায় না।

স্তর ৩: এই স্তরে শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে টিউমারটি সম্পূর্ণ অপসারণ করা সম্ভব হয় না বলে শল্যচিকিৎসার পরও কিছু টিউমার রোগীর দেহে থেকে যায়।

স্তর ৪: রক্তের মাধ্যমে টিউমারটি যখন শরীরের দূরবর্তী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে তখন রোগটি স্তর ৪-এ আছে বলে ধরা হয়। এই স্তরে রোগটি ফুসফুস, যকৃত, হাড় অথবা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়।

স্তর ৫: এই স্তরে উভয় কিডনী এই টিউমার দ্বারা আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ ও উপসর্গসমূহ

প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগের কোনো লক্ষণ ও উপসর্গ দেখা যায় না। বেশিরভাগ সময় শিশুর পরিচর্যাকারী মা অথবা পরিবারের অন্য কোনো ব্যক্তি শিশুর পেটে অস্বাভাবিক ফোলা কোনোকিছুর বা চাকার উপস্থিতি লক্ষ করে ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। অনেক সময় শিশুটিকে যখন ছোটখাটো কোনো অসুস্থতা, যেমন জ্বর বা সর্দি-কাশির চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে নেওয়া হয়, তখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় ডাক্তার রোগটির উপস্থিতি নির্ণয় করতে পারেন। এছাড়া, প্রাথমিক অবস্থায় শিশুর পেট-ব্যথা, পেট-ফোলা, ক্ষুধামন্দা, বমি-বমি ভাব কিংবা বমি-হওয়া—এসব উপসর্গ দেখা দিতে পারে। শিশুটির ঘনঘন জ্বরও হতে পারে এবং প্রস্রাবের সাথে রক্ত যেতে পারে। শতকরা ২৫-৬০ ভাগ ক্ষেত্রে শিশুর উচ্চ রক্তচাপ থাকে। শতকরা ৩০ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত যেতে দেখা যায়।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা

প্রস্রাব পরীক্ষা: সাধারণ প্রস্রাব পরীক্ষায় প্রস্রাবে রক্তের উপস্থিতি পাওয়া যেতে পারে।

রক্ত পরীক্ষা: রোগীর রক্ত পরীক্ষায় রক্তশূন্যতা দেখা যায়।

আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা: এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষার সাহায্যে কিডনীতে উইলমস' টিউমারের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। টিউমারটির আকার-আকৃতি ও কিডনীর কোন অংশ থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে তা নির্ণয় করা যায়। পেটের মধ্যে এর বিস্তৃতি এবং পেটের অন্যান্য অংশে টিউমারটি ছড়িয়ে পড়েছে কি না তা-ও জানা যায়। এই পরীক্ষা সম্পূর্ণ ব্যথামুক্ত, নিরাপদ এবং খুবই সহজলভ্য বলে রোগী এবং ডাক্তার উভয়ের কাছেই এটি একটি গ্রহণীয় পরীক্ষা।

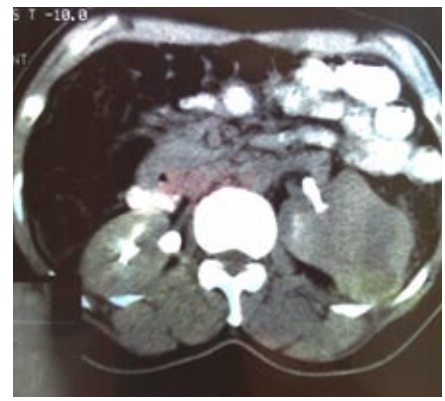

সিটি স্ক্যান পরীক্ষার সাহায্যে উইলমস' টিউমারের অবস্থা কোন স্তরে আছে সেসম্পর্কে পরিষ্কার প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়

সিটি স্ক্যান পরীক্ষা: এটি একটি বিশেষ ধরনের এক্স-রে পরীক্ষা। এই পরীক্ষার সাহায্যে টিউমারটির আকৃতি ও বিস্তৃতি সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা যায়। চিকিৎসার আগে রোগের সঠিক স্তর-বিন্যাসের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। যদিও কিছুটা ব্যয়বহুল তবুও অপারেশনের জন্য পরীক্ষাটি অতীব জরুরি।

সূচ বায়োপ্সি: চিকিৎসার আগে রোগটি নির্ণয়ের জন্য এই পরীক্ষাটি করতে হয়। রোগীর দেহে সূক্ষ্ম সূচ প্রবেশ করিয়ে টিউমারটি থেকে কোষ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে টিস্যু সংগ্রহ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সঠিক রোগ-নির্ণয় করা হয়।

এগুলো ছাড়াও বুকের এক্স-রে, মস্তিষ্কের সিটি স্ক্যান, হাড়ের স্ক্যান ও যকৃতের কার্যকারিতা পরীক্ষা (Liver function test), ইত্যাদির সাহায্যে রোগটির স্তর-বিন্যাস সঠিকভাবে জেনে সঠিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

চিকিৎসা

চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হলো উদ্ভূত জটিলতা কমিয়ে এই অসুখ থেকে রোগীকে যথাসম্ভব পূর্ণ নিরাময় করে তোলা। শুধুমাত্র একধরনের চিকিৎসায় এ-রোগ থেকে রোগীকে সবসময় মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয় না। এজন্য অপারেশন (শল্যচিকিৎসা), রেডিওথেরাপী ও কেমোথেরাপীর সমন্বয়ে এ-রোগের চিকিৎসা করা হয়।

শল্যচিকিৎসা (অপারেশন): যেসব রোগীর একটিমাত্র কিডনী আক্রান্ত হয়েছে এবং টিউমারটি পেটের মধ্যভাগে সীমিত আছে অর্থাৎ টিউমারটি পেটের আশপাশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আক্রমণ করে নি (স্তর-বিন্যাসের বিবেচনায় স্তর ১ কিংবা ২-এর মধ্যে আছে) এবং কিডনীসহ টিউমারটি শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে সম্পূর্ণ অপসারণ করা যায়, সেসব রোগীকে চিকিৎসা দ্বারা সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব। শল্যচিকিৎসা পেট কেটে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে অথবা টিউমারটি ছোট হলে পেট ছিদ্র করে ল্যাপারোস্কপিক পদ্ধতিতে করা যায়। টিউমারটি যদি খুব ছোট হয় অথবা উভয় কিডনীই যদি টিউমার দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে নেফ্রোন-স্পেয়ারিং

সার্জারির মাধ্যমে আংশিক কিডনী রেখে টিউমার অপসারণ করা যায়। উভয় কিডনী অপসারণ করতে হলে অপসারণের পর রোগীর ডায়ালাইসিস ও পরবর্তী পর্যায়ে কিডনী প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে। তবে, এসব ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসার আগে কেমোথেরাপী এবং পরে কেমো ও রেডিওথেরাপীর প্রয়োজন হয়।

কেমোথেরাপী: উইলমস' টিউমার একটি কেমো-সংবেদনশীল টিউমার অর্থাৎ এ-রোগে কেমোথেরাপী খুবই কার্যকর। সাধারণত ভিনক্রিস্টিন, ড্যাকটিনোমাইসিন, ডক্সোরুবিসিন, সাইক্লোফসফামাইড, ইটোপোসাইড প্রভৃতি অষুধ বিভিন্ন মিশ্রণে ও মাত্রায় ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিক স্তরে, যেমন স্তর ১ ও ২-এ, রোগটি ধরা পড়লে শল্যচিকিৎসার সাথে কেমোথেরাপী প্রয়োগ করলে ফলাফল খুবই ভালো হয়। উচ্চস্তরে, যেমন স্তর ৩ থেকে ৫-এ, চিকিৎসার ফলাফল অনেকটাই হিস্টোপ্যাথলজি পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে। অনেকসময় শল্যচিকিৎসা ও কেমোথেরাপীর পর পুনরায় শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

রেডিয়েশন থেরাপী: উইলমস' টিউমার রেডিও-থেরাপীর প্রতিও খুব সংবেদনশীল। সেজন্য এ-রোগে রেডিওথেরাপীও খুব কার্যকর। তবে, রেডিওথেরাপী শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করে এবং শিশুর হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও যকৃতে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বলে এই পদ্ধতির পরিবর্তে শল্যচিকিৎসা ও কেমোথে-রাপী অধিক ব্যবহৃত হয়। হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার ফলাফল যদি অনুকূল না-হয় এবং রোগটি যদি উচ্চতর স্তরে (স্তর ৩ থেকে ৫-এ) থাকে তবে রেডিওথেরাপী প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

চিকিৎসার ফলাফল

বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার সমন্বয় সাধন করলে এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ-রোগের চিকিৎসায় খুবই আশাব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া যায়। আগেই বলা হয়েছে, রোগটি ১ থেকে ২ স্তরে থাকলে রোগী পূর্ণভাবে সুস্থও হয়ে যেতে পারে। উচ্চতর পর্যায়ের রোগীদের ক্ষেত্রে যদি টিউমারটির হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল ফলাফল অনুকূল হয় তবে শতকরা ৯০ ভাগ রোগীর ৪ বছর এবং তার অধিক সময় বাঁচার সম্ভাবনা থাকে। তবে, হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল ফলাফল অনুকূল না-হলে এবং টিউমারটি উচ্চতর স্তরে (স্তর ৩ থেকে ৫-এ) থাকলে শল্যচিকিৎসাসহ বিভিন্ন ধরনের কেমো ও রেডিওথে-রাপীর সমন্বিত চিকিৎসায় শতকরা ৬০-৯০ ভাগ রোগীকে ২ বছর পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়।

নতুন নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতি এবং উন্নততর কেমোথেরাপী-সংশ্লিষ্ট অষুধের আবিষ্কার এই রোগ নিরাময়ে অদূর ভবিষ্যতে আরো বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বড়দের মূত্রনালীর সংক্রমণ: রোগতত্ত্ব ও প্রতিকার

আনাদিল আলম, সৈয়দ হাসিবুল হাসান
আইসিডিডিআর,বি

মূত্রনালীর সংক্রমণ (urinary tract infection—UTI) বলতে সাধারণত কিডনী, ইউরেটার, ব্লাডার (মূত্রথলি) বা ইউরেথ্রা (মূত্রনালী)-র প্রদাহকে বুঝানো হয়ে থাকে। শরীর থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগে প্রস্রাব এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

মূত্রনালীর যেকোনো অংশ সংক্রামিত হতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে মূত্রনালীর যত উপরের দিকে সংক্রমণ ঘটে তাকে ততটা গুরুতর বলে ধরে নেওয়া হয়।

বেশি সংক্রমণ সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী বলে ধারণা করা হয়। পুরুষদের এধরনের সংক্রমণ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম কারণ তাদের মূত্রনালীর শেষভাগ শরীরের বহিরাংশে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক পরিবেশে থাকে এবং প্রস্টেট গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস সংক্রমণ-সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার সাথে লড়তে পারে।

শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ মহিলা এবং ১২ ভাগ পুরুষ জীবনের কোনো একসময় মূত্রনালীর সংক্রমণ দ্বারা আক্রান্ত হয়।

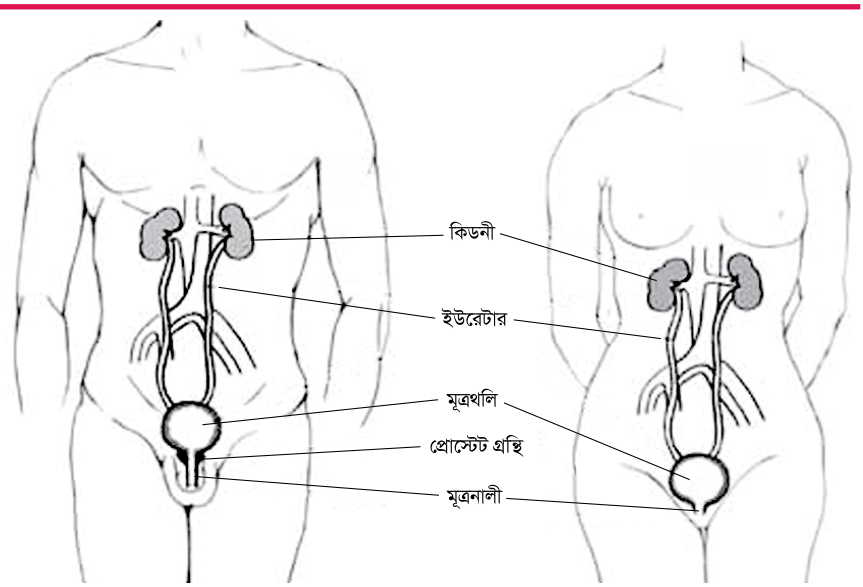

মূত্রনালীর বিভিন্ন অংশ

মূত্রনালীর সংক্রমণকে সাধারণ ও জটিল এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

- সুস্থ মূত্রনালীতে সংক্রমণ ঘটলে এবং তা শরীরের অন্যান্য অংশে না-ছড়ালে তাকে সাধারণ সংক্রমণ হিসেবে ধরা হয়। এধরনের সংক্রমণ সহজ চিকিৎসার সাহায্যে দূর করা সম্ভব।
- শারীরিক ত্রুটি, শরীরের অন্যান্য অংশে সংক্রমণের উপস্থিতি এবং শরীরের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন সমস্যা জটিল সংক্রমণের সৃষ্টি করতে পারে। অনেক অ্যান্টিবায়োটিক অষুধ এধরনের সংক্রমণে কাজ করে না। এসব সংক্রমণ দূর করা বেশ কঠিন।

কমবয়সী ছেলে এবং পঞ্চাশ বছরের কমবয়সী পুরুষদের চাইতে কমবয়সী মেয়ে এবং মহিলাদের মধ্যে এধরনের সংক্রমণ বেশি ঘটতে দেখা যায়। এর সঠিক কারণ জানা নেই, তবে পুরুষ ও মহিলাদের শারীরিক গঠনে বিভিন্ন পার্থক্য (যেমন মহিলাদের মূত্রনালীর দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত কম) মহিলাদের মধ্যে

কারণ

প্রস্রাব সাধারণত জীবাণুমুক্ত হয়ে থাকে। সংক্রমণ তখনই ঘটে যখন কোনো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া প্রস্রাবের মধ্যে প্রবেশ করে বেড়ে উঠতে থাকে।

কমপক্ষে ৯০% সাধারণ সংক্রমণের জন্য দায়ী *ইশকেরিশিয়া কোলাই*-নামক একধরনের ব্যাকটেরিয়া, যা সংক্ষেপিত ই. *কোলাই* (*Escherichia coli*) নামে বেশি পরিচিত। এসব ব্যাকটেরিয়া সাধারণত বৃহদান্ত্র, মলাশয় এবং মলদ্বারে থাকে।

এসব ব্যাকটেরিয়া মলদ্বারের আশপাশের অংশ থেকে মূত্রনালীর মুখ পর্যন্ত যেতে পারে। এর দু'টি প্রধান কারণ হলো অপরিচ্ছন্নতা এবং যৌনমিলন।

সাধারণত প্রস্রাব করার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া ইউরেথ্রা থেকে বেরিয়ে যায়। তবে, ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা খুব বেশি হলে প্রস্রাবের মাধ্যমে তাদের বিস্তার রোধ করা যায় না।

ব্যাকটেরিয়াসমূহ ইউরেথ্রা থেকে ব্লাডারে পৌঁছাতে পারে, যেখানে তারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। এই ব্যাকটেরিয়াগুলো ব্লাডার থেকে ইউরেটারের মধ্য দিয়ে আরো উপরের দিকে গিয়ে সংক্রমণের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করতে পারে।

এসব ব্যাকটেরিয়া কিডনীতে পৌঁছে কিডনীর সংক্রমণ বা pyelonephritis ঘটাতে পারে, যা দ্রুত চিকিৎসা না-করালে ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে।

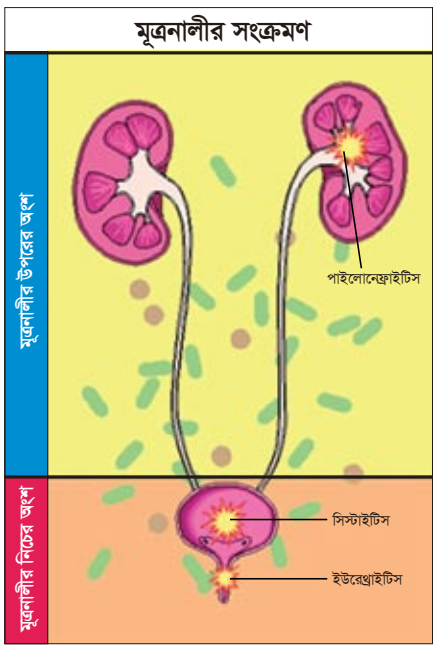

কাদের ক্ষেত্রে মূত্রনালীর সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা বেশি

- যাদের মূত্রনালীতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন কিছু রয়েছে, যেমন কিডনীর পাথর।
- যাদের এমন কোনো শারীরিক অবস্থা আছে, যার ফলে ব্লাডার খালি করে প্রস্রাব করতে পারে না, যেমন মেরুদণ্ডে আঘাতজনিত জটিলতা বা মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিক বন্ধ হয়ে-যাওয়ার পর ব্লাডার সম্পূর্ণভাবে খালি করার অক্ষমতার কারণে সৃষ্ট জটিলতা।
- যাদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, যেমন এইডস বা ডায়বেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি। চিকিৎসার প্রয়োজনে যাদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে দমিয়ে রাখার জন্য বিশেষ ধরনের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে তারাও মূত্রনালীর সংক্রমণে আক্রান্ত হতে পারে।
- যৌনতার বিবেচনায় সক্রিয় মহিলাদের ক্ষেত্রে যৌনমিলনের ফলে বেশিসংখ্যক ব্যাকটেরিয়া তাদের ব্লাডারে প্রবেশ করতে পারে। যেসব মহিলা ঘনঘন যৌনমিলন করে থাকে তাদের সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। ঘনঘন যৌনমিলনের ফলে সংক্রামিত হওয়ার এমন ঘটনাকে 'হানিমুন সিস্টাইটিস' বলা হয়। এসব ক্ষেত্রে যৌনমিলনের পর প্রস্রাবের মাধ্যমে ব্লাডার খালি করে মূত্রনালীর সংক্রমণ লাঘব করা যেতে পারে।
- যেসব মহিলা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য একধরনের ডায়াফ্রাম ব্যবহার করে থাকেন।
- যেসব পুরুষের প্রস্টেট গ্রন্থি আকারে বড় হয়ে উঠেছে। সাধারণত বয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে এধরনের সমস্যা বেশি দেখা যায়।

লক্ষণ ও উপসর্গ

মূত্রনালীর নিচের অংশে সংক্রমণ ইউরেথ্রাকে আক্রান্ত করলে তাকে ইউরেথ্রাইটিস এবং ব্লাডারকে আক্রান্ত করলে তাকে সিস্টাইটিস বলা হয়ে থাকে। এধরনের সংক্রমণের লক্ষণ ও উপসর্গগুলো হলো:

- প্রস্রাব করার সময় ব্যথা বা জ্বালাপোড়া
- বারবার প্রস্রাব করা, এমনকি রাতের বেলায়ও প্রস্রাবের বেগ-আসা; প্রস্রাবের বেগ অনুভব করলেও সামান্য পরিমাণে প্রস্রাব হওয়া
- প্রস্রাব চেপে রাখা যাচ্ছে না এমন অনুভূত-হওয়া এবং প্রস্রাব করার জন্য প্রচণ্ড তাড়না বোধ করা
- প্রস্রাব করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না-করা এবং পুরোপুরিভাবে প্রস্রাব করা যাচ্ছে না এমন মনে-হওয়া
- ধোঁয়াটে, দুর্গন্ধযুক্ত বা রক্তযুক্ত প্রস্রাব
- তলপেটে ব্যথা
- হালকা জ্বর (১০১° ফারেনহাইটের কম), ঠাণ্ডা অনুভূত-হওয়া এবং ভালো বোধ না-করা

মূত্রনালীর উপরের অংশে সংক্রমণ সাধারণত কিডনী বা ইউরেটারকে আক্রান্ত করে, যাকে পাইলোনেফ্রাইটিস বলা হয়ে থাকে। খুব দ্রুত এর লক্ষণগুলো ফুটে ওঠে, যা মূত্রনালীর নিচের অংশে সংক্রমণের লক্ষণগুলোর মতো হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে। এসব লক্ষণগুলো হলো:

- বেশ জ্বর (১০১° ফারেনহাইটের বেশি)
- কাঁপুনি দিয়ে ঠাণ্ডা অনুভূত-হওয়া
- বমি-বমি ভাব
- বমি
- পিঠে বা শরীরের একপাশে ব্যথা-হওয়া; সাধারণত কোমরের কাছে ব্যথা হয়ে থাকে
- বয়স্ক মানুষদের জ্বর-হওয়া, ক্ষুধামন্দা, ক্লান্তিবোধ, মানসিক অবস্থার পরিবর্তন-ঘটা

গর্ভবতী মহিলাদের মূত্রনালীর সংক্রমণ ঘটার আশঙ্কা বেশি থাকে। গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে আলাদা কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তাদের উচিত শিশুর জন্মের আগে নিয়মিত পরীক্ষাগুলোর সাথে সাথে প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া, কারণ অজানা কোনো সংক্রমণ অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা সৃষ্টি করতে বা গর্ভপাত ঘটাতে পারে।

মূত্রনালীতে সংক্রমণের লক্ষণ অনেকসময় যৌনরোগের লক্ষণগুলোর মতো হয়ে থাকে।

কখন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত

যেকোনো প্রাপ্তবয়স্ক লোক বা শিশুর মধ্যে উপরোক্ত লক্ষণ বা উপসর্গগুলো দেখা দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া নিরাপদ। মূত্রনালীর উপরের যেকোনো অংশে সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিলে অনতিবিলম্বে চিকিৎসা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

কারোর মূত্রনালীতে সংক্রমণ ঘটলে এবং নিচে উল্লেখিত অবস্থাগুলো থাকলে বুঝতে হবে: সংক্রমণের ধরন বেশ গুরুতর এবং এ-অবস্থায় দ্রুত কোনো হাসপাতালের জরুরি বিভাগে যেতে হবে।

- বমি হলে এবং বমির কারণে তরলজাতীয় পদার্থ এবং অষুধ পেটে রাখতে না-পারলে
- দু'দিন অ্যান্টিবায়োটিক অষুধ খাওয়ার পরেও জটিলতা না-কমলে
- গর্ভবতী অবস্থায়
- যাদের ডায়াবেটিস আছে বা এমন কোনো রোগ আছে, যা রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে, যেমন এইডস
- যারা রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দমিয়ে রাখার জন্য বিশেষ অষুধ ব্যবহার করছেন, যেমন ক্যান্সারের রোগীদের জন্য ব্যবহৃত কেমোথেরাপী

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা ও শল্যচিকিৎসা-সংক্রান্ত ইতিহাস, অষুধের ব্যবহার, অভ্যাস এবং জীবনযাপন প্রণালী সম্পর্কে রোগীর দেওয়া তথ্যের ওপর মূত্রনালীর সংক্রমণ চিহ্নিত করার পদ্ধতি নির্ভর করে। শারীরিক পরীক্ষা এবং পরীক্ষাগারে পরীক্ষার সাহায্যে চূড়ান্তভাবে সংক্রমণ চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

ডাক্তার রোগীর প্রস্রাব পরীক্ষার জন্য গবেষণাগারে পাঠাতে পারেন। ইউরিনালাইসিস হলো পরীক্ষাগারে প্রস্রাব পরীক্ষার বহুল-ব্যবহৃত পদ্ধতি। প্রস্রাবের নমুনা পরীক্ষা করে সংক্রমণের জন্য দায়ী বিভিন্ন ধরনের উপাদান, যেমন শ্বেত রক্তকণিকা, ব্যাকটেরিয়া, প্রভৃতির উপস্থিতি সনাক্ত করা হয়ে থাকে। সব রোগীর জন্য প্রস্রাবের কালচার পরীক্ষা অপরিহার্য নয়, কারণ মূত্রনালীর বেশিরভাগ সংক্রমণের জন্য সাধারণত একই ধরনের ব্যাকটেরিয়া দায়ী।

সাধারণত পাইলোনেফ্রাইটিস অথবা কিডনী বিকল হয়ে যাওয়ার মতো জটিল অবস্থা ছাড়া রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না।

পরীক্ষার জন্য রোগীকে পরিচ্ছন্নভাবে মধ্যবর্তী পর্যায়ের প্রস্রাব সংগ্রহ করতে বলা হতে পারে। এক্ষেত্রে মধ্যবর্তীকালীন প্রস্রাব সংগ্রহ বলতে বুঝায় প্রথমে টয়লেটে কিছুটা প্রস্রাব করে তারপর মধ্যবর্তী পর্যায়ের প্রস্রাব সংগ্রহ করা। বিষয়টি হলো, রোগী প্রথমে-আসা প্রস্রাব সংগ্রহ করবেন না, কারণ এই অংশটুকু অনেকসময় দূষিত হতে পারে। পরিশুদ্ধ কাপড় বা সাবান এবং পানির সাহায্যে রোগীর ইউরেথ্রার বাইরের অংশ ভালোভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে। এরপর মধ্যবর্তী পর্যায়ের প্রস্রাব সংগ্রহ করতে হবে।

লক্ষণের ওপর নির্ভর করে যৌনতার বিবেচনায় সক্রিয় কমবয়সী মহিলাদের পেলভিক পরীক্ষা-নামক পেটের নিচের অংশের একটি পরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে, কারণ পেলভিক সংক্রমণের লক্ষণগুলো অনেকসময় মূত্রনালীর সংক্রমণের লক্ষণের মতো হয়।

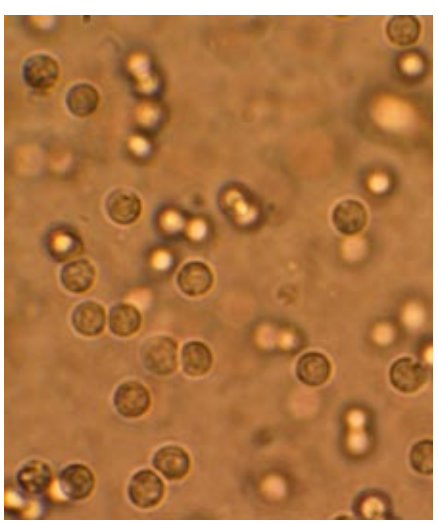

সংক্রামিত মূত্রনালীতে সাদা সাদা অজস্র কোষ দেখা যায়

পুরুষদের ক্ষেত্রে মলদ্বারের পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে, যাতে প্রস্টেট-এর পরীক্ষা করা যায়। প্রস্টেট গ্রন্থির সংক্রমণ (prostatitis)-এর ক্ষেত্রে মূত্রনালীর সংক্রমণের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী অ্যান্টিবায়োটিক কোর্সের প্রয়োজন হয়। নিচের পরীক্ষাগুলো থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়, যা চিকিৎসার জন্য সহায়ক হয়:

- আল্ট্রাসনোগ্রামের সাহায্যে কিডনী এবং ব্লাডারের ত্রুটি নির্ণয় করা যায়।
- ফ্লুরোস্কপিক পরীক্ষার সাহায্যে শিশুদের শারীরিক ত্রুটি পরীক্ষা করা যায়, যা ভবিষ্যতে মূত্রনালীর সংক্রমণের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।
- ইন্ট্রাভেনাস পাইলোগ্রাম এক বিশেষ ধরনের ধারাবাহিক এক্স-রে যার দ্বারা পার্থক্য প্রদর্শনকারী বিশেষ রঙের সাহায্যে মূত্রনালীতে কোনো অস্বাভাবিকতা থাকলে তা চিহ্নিত করা যায়।
- সিস্টোস্কপি প্রক্রিয়ায় একধরনের সরু নরম টিউবের সাহায্যে ইউরেথ্রার মধ্য দিয়ে ব্লাডারে একটি ছোট্ট ক্যামেরা প্রবেশ করানো হয়ে থাকে। এর ফলে ব্লাডারে সংক্রমণ ঘটাতে পারে এমন কোনো অস্বাভাবিকতা থাকলে তা ধরা পড়ে।
- সিটি স্ক্যানের সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুরো মূত্রনালীর ত্রিমাত্রিক চিত্র দেখা যায়।

চিকিৎসা

নিজের সেবাযত্ন করা

নিম্নোক্ত উপায়ে রোগী নিজেই জটিলতা কমাতে পারেন:

- স্বাস্থ্য সেবাদানকারীর চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরামর্শ মেনে চলতে হবে।
- ভালো বোধ করলেও সংক্রমণ পুরোপুরি দূর না-হওয়া পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিক অষুধ চালিয়ে যেতে হবে।
- প্রয়োজনে ব্যথানাশক অষুধ খেতে হবে।
- গরম-পানি ভর্তি বোতলের বা ব্যাগের সাহায্যে সেক দিয়ে ব্যথা কমানোর চেষ্টা করা যেতে পারে।
- প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে।
- কফি, অ্যালকোহল এবং মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলতে হবে; এগুলো ব্লাডারের ক্ষতি করে।
- ধুমপান পরিহার করতে হবে; ধুমপানের ফলে ব্লাডারের ক্ষতি হয় এবং একে ব্লাডার ক্যান্সারের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

ডাক্তারী চিকিৎসা

মূত্রনালীর সাধারণ এবং জটিল ধরনের সংক্রমণের চিকিৎসা হিসেবে সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়ে থাকে। রোগের অবস্থার ওপর নির্ভর করে কোন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক কতদিনের জন্য দেওয়া হবে তা স্থির করা হয়।

মূত্রনালীর নিচের অংশে সংক্রমণ বা সিস্টাইটিস

- মূত্রনালীর সংক্রমণ রয়েছে কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে সুস্থ এমন কমবয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে সাতদিনের অ্যান্টিবায়োটিক কোর্সই যথেষ্ট। কোন কোর্সটি রোগীর জন্য উপযোগী তা তার স্বাস্থ্য সেবাদানকারী ঠিক করবেন।
- প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মূত্রনালীর সংক্রমণের বেলায় সাধারণত সাত থেকে দশদিনের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়ে থাকে। প্রস্টেট গ্রন্থি সংক্রামিত হয়ে প্রস্টেটাইটিস হলে চার সপ্তাহব্যাপী অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

মূত্রনালীর উপরের অংশে সংক্রমণ বা পাইলোনেফ্রাইটিস

পাইলোনেফ্রাইটিস-এর কোনো উপসর্গ দেখা দিলে এবং তার সাথে নিম্নোক্ত অবস্থাগুলো থাকলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন পড়তে পারে:

- রোগীকে খুব অসুস্থ দেখালে
- রোগী গর্ভবতী হলে
- সাধারণত দেওয়া হয়ে থাকে এমন অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসায় অসুখ ভালো না-হলে
- ডায়াবেটিসের মতো এমন কোনো রোগ থাকলে, যা শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাকে প্রতিহত করে অথবা বিশেষ প্রয়োজনে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দমিয়ে রাখা হয়েছে এমন কোনো চিকিৎসার অধীনে থাকলে
- রোগী যদি বমি-বমি ভাব বা বমির কারণে কোনো খাবারই পেটে রাখতে না-পারে
- আগে কোনো কিডনীর রোগ হয়ে থাকলে, বিশেষ করে পূর্ববর্তী ৩০ দিনের মধ্যে পাইলোনেফ্রাইটিসে আক্রান্ত হয়ে থাকলে
- শরীরে ক্যাথেটারের মতো কোনো চিকিৎসা-উপকরণ লাগানো থাকলে
- কিডনীতে পাথর থাকলে

যৌনরোগের মতো একই ধরনের ব্যাকটেরিয়া পুরুষ এবং মহিলাদের ইউরেথ্রাইটিসে আক্রান্ত করতে পারে। কাজেই, পুরুষদের ক্ষেত্রে লিঙ্গ দিয়ে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে যোনিপথে পুঁজ নিঃসরণের মতো যৌনরোগের কোনো উপসর্গ দেখা দিলে সঠিক অ্যান্টিবায়োটিকের সাহায্যে চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

প্রতিরোধ

- প্রতিবার টয়লেটে গিয়ে প্রস্রাব-পায়খানার পর মহিলারা সামনের দিক থেকে পেছন দিক পর্যন্ত ভালোভাবে ধুয়ে-মুছে ফেলবেন—পেছন দিক থেকে সামনের দিকে মোছা যাবে না। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে পায়ুপথে-থাকা ব্যাকটেরিয়া ইউরেথ্রাতে প্রবেশ করতে পারে না।
- সবসময় ব্লাডার খালি করে প্রস্রাব করতে হবে, বিশেষ করে যৌনমিলনের পর এটি করা খুবই জরুরি।
- প্রচুর পরিমাণে তরল পান করতে হবে। দেখা গেছে, করমচার রস মূত্রনালীর সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। করমচা ব্লাডারে ব্যাকটেরিয়া লেগে-থাকার ঝুঁকি হ্রাস করে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে।

সাধারণত বেশি জটিল নয় এমন সিস্টাইটিস বা পাইলোনেফ্রাইটিসে আক্রান্ত রোগীদের সংক্রমণ অ্যান্টিবায়োটিকের সাহায্যে পুরোপুরি সারিয়ে তোলা সম্ভব। মনে রাখতে হবে, এধরনের সংক্রমণের দ্রুত চিকিৎসা করা না-হলে মূত্রনালীতে স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে।

সংলাপ রিপোর্ট

এমএ রহীম, আইসিডিডিআর,বি

১ *সায়েন্স* নামের বিশ্বখ্যাত জার্নালে নিপাহ ভাইরাস নিয়ে আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণাকর্মের ওপর ফিচার প্রকাশ

আইসিডিডিআর,বি এপর্যন্ত নিপাহ ভাইরাস এবং এর দ্বারা সৃষ্ট নিপাহ এনসেফ্যালাইটিস নামের প্রাণঘাতী জ্বরজাতীয় রোগ নিয়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী গবেষণা সম্পন্ন করেছে তার ওপর *সায়েন্স* নামের বিশ্বখ্যাত জার্নাল সম্প্রতি (৪ মার্চ ২০১১ সংখ্যা, ভলিয়্যুম ৩৩১) একটি সচিত্র ফিচার প্রকাশ করেছে। আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স কর্তৃক প্রকাশিত এই জার্নাল কেবল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলাফলই প্রকাশ করে থাকে। অতএব, নিপাহ ভাইরাস এবং এর দ্বারা সৃষ্ট নিপাহ এনসেফ্যালাইটিস রোগ নিয়ে আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণাকর্ম কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই বুঝা যায়। এর আগে সিবিএস টেলিভিশন নেটওয়ার্কের ডিসকভারি চ্যানেলের মতো টিভি চ্যানেলও এর ওপর বিশেষ ডকুমেন্টারি তৈরি করেছে, যা ২০০৮ সাল থেকে প্রদর্শিত হচ্ছে।

এই গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইসিডিডিআর,বি-র বিজ্ঞানীদের বেশ কয়েকজন এবং ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি, ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ (আইইডিসিআর)-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মাহমুদুর রহমানের সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে এই ফিচার রচিত হয়েছে। বর্তমানে এ-বিষয়ে আইসিডিডিআর,বি-র গবেষক দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. স্টিফেন পি লুবি। অন্য যেসব বিজ্ঞানী ও অনুসন্ধানকারী এই গবেষক দলে আছেন তাঁরা হলেন: মিস এমিলি গার্লি, ড. জাহাঙ্গীর হোসেন, মিস রেবেকা সুলতানা এবং ড. সালাহ উদ্দিন খান। বাংলাদেশে নিপাহ-সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও জরিপকাজে এরা পূর্বাপর জড়িত আছেন। তাঁদের অধিকাংশের সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে *সায়েন্স* জার্নাল এই ফিচারে নিপাহ ভাইরাস ও সংশ্লিষ্ট রোগের কারণ, রোগতত্ত্ব ও রোগের গতি-প্রকৃতি বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছে।

নিপাহ ভাইরাসজনিত এনসেফ্যালাইটিস রোগটি প্রথম দেখা দেয় ১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়ায়। সেখানে এটি শুকর ও শুকর-প্রতিপালনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকদের মধ্যে দেখা দেয়। এ-সংক্রান্ত গবেষণায় আইসিডিডিআর,বি-র অবদানকে বিশদভাবে তুলে ধরার আগে ফিচারটিতে মালয়েশিয়ায় এর প্রথম প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। মালয়েশিয়ার জনস্বাস্থ্য বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ প্রথম এটিকে সোয়াইন ফ্লু বা জাপানীজ এনসেফ্যালাইটিস বলে মনে করেছিলেন। তাঁরা তখন ভেবেছিলেন শুকর এই ভাইরাসের বাহক। পরে ১৯৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)-র সহযোগিতায় তাঁরা এই ভাইরাসের ধরন বুঝতে সক্ষম হন এবং এমন সিদ্ধান্তে আসেন যে, এর প্রকৃতি হেন্দ্রা (Hendra) ভাইরাসের সমতুল্য, যা অস্ট্রেলিয়ায় ঘোড়া ও ঘোড়া-প্রতিপালকদের মধ্যে প্রাণঘাতী সংক্রমণ ঘটিয়েছিলো এবং যার বাহক ফলখেকো একধরনের

বাঁশের চিলতা দিয়ে তৈরি ঢাকনার সাহায্যে সুরক্ষিত একটি খেজুরের গাছ থেকে রস সংগ্রহ করছেন একজন গাছী

বাদুড়। মালয়েশিয়ার বিজ্ঞানীগণ সবশেষে *টেরোপাস জায়গেনটেয়াস* নামের ফলখেকো বাদুড়ের মধ্যে এই ভাইরাসের অস্তিত্ব খুঁজে পান এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, বাদুড় এই ভাইরাসের প্রাকৃতিক বাহক। বাদুড়ের মলমূত্র এবং ভাইরাসে দূষিত আধ-খাওয়া ফলের সান্নিধ্যে এসে শুকরেরা আক্রান্ত হয়েছে এবং পরিশেষে শুকর-প্রতিপালকদের মধ্যে সংক্রমণ ঘটিয়েছে বলে মালয়েশিয়ান বিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম নিপাহ এনসেফ্যালাইটিস-এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় ২০০১ সালে। দেশের মধ্যভাগের ও দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে জরুরি ভিত্তিতে আইসিডিডিআর,বি ও আইইডিসিআর যৌথভাবে সিডিসি-র আর্থিক সহায়তায় এর কারণ অনুসন্ধান শুরু করে। এই অনুসন্ধানে ইকোহেলথ অ্যালায়্যান্স নামের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও আইসিডিডিআর,বি-র গবেষক দল সহযোগিতামূলক কাজ করে। উপর্যুপরি অনুসন্ধানে নিশ্চিত হওয়া গেছে: *টেরোপাস জায়গেনটেয়াস* নামের ফলখেকো বাদুড় (যা 'ভারতীয় বাদুড়' হিসেবে পরিচিত) নিপাহ ভাইরাসের প্রাকৃতিক বাহক। আইসিডিডিআর,বি-র অনুসন্ধানকারীগণ এও লক্ষ করলেন: জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে প্রধানত বাংলাদেশের মধ্যভাগের ও দক্ষিণাঞ্চলে জেলাগুলোতে এ-রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে যখন স্থানীয় লোকজন খেজুরের রস সংগ্রহ করে তা পান করে। রোগতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে ব্যবহৃত ইনফ্রারেড ক্যামেরাচিত্র এবং গবেষণাগারের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গবেষকগণ নিশ্চিত হন যে, বাদুড় দ্বারা দূষিত খেজুরের রস পান করেই লোকজন এ-রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। গাছী নামের একশ্রেণীর লোক খেজুর গাছের উপরের নরম অংশে একটি ছিদ্র তৈরি করে এবং এতে বাঁশের চিলতা ঢুকিয়ে কোনো মাটির পাত্রে এই রস সংগ্রহ করে। এই সুস্বাদু রস চুষে খাওয়ার সময় বাদুড়ের জিহ্বা থেকে নিঃসৃত শ্লেষ্মা, কখনো কখনো এমনকি বাদুড়ের মলমূত্র দ্বারা এই রস নিপাহ ভাইরাসে দূষিত হয়, যা পান করে লোকজন রোগে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির সেবাযত্ন করার মাধ্যমে অন্যরাও আক্রান্ত হয়।

রস সংগ্রহ করার সময় তা যেন বাদুড় দ্বারা এভাবে দূষিত হতে না-পারে তার জন্যও আইসিডিডিআর,বি-র বিজ্ঞানীগণ একটি উপায় উদ্ভাবন করেছেন। বাদুড়ের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত রাখার কৌশল হিসেবে তাঁরা বাঁশের চিলতা দিয়ে তৈরি একধরনের ঢাকনা দিয়ে রস সংগ্রহের পুরো জায়গাটি ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। ইনফ্রারেড ক্যামেরাচিত্র থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে, বাদুড় থেকে নিপাহ ভাইরাস দ্বারা খেজুরের রসের দূষণরোধে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর।

নিপাহ ভাইরাসজনিত রোগের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ছাড়াও অ্যামিলোরাইড এবং ক্লোরোকুইন নামের দু'টি অষুধ (যা সাধারণত উচ্চ রক্তচাপ ও ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়) এখন পরীক্ষামূলক পর্যায়ে আছে। ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে *সায়েন্সনাউ* নামের ম্যাগাজিনে প্রথম খবর বেরিয়েছিলো যে, রবিন বাকল্যান্ড-এর নেতৃত্বে ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ অ্যান্ড মেডিকেল রিসার্চ (ইনসার্ম)-এর একদল বিজ্ঞানী প্রমাণ পেয়েছেন, এই দু'টি অষুধ নিপাহজনিত রোগের চিকিৎসায় কার্যকর। এর পর থেকে অনেক দেশেই এগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে।

নিপাহ ভাইরাসজনিত রোগের ভয়াবহতা নিয়ে ড. স্টিভ লুবি বলেছেন, "নিপাহ অত্যন্ত খারাপ প্রকৃতির একটি ভাইরাস, যা মানুষকে অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তা ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে...তরতাজা যুবক শ্রেণীর লোকজনও এর আক্রমণে দলেদলে মরতে থাকে। এটি সত্যিই এক মারাত্মক ধরনের সামাজিক স্বাস্থ্যসমস্যা"।

আইইডিসিআর-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মাহমুদুর রহমান মনে করেন বাংলাদেশে এই পরিস্থিতি যেকোনোভাবে মোকাবিলা করতে আমরা সক্ষম হবো কারণ যথাযথ ব্যবস্থা না-নিলে এই স্বাস্থ্যসমস্যার পরিণতি কী হতে পারে এ-বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার সম্পূর্ণ সজাগ। তিনি বলেন, "আমি বিশ্বাস করি আমরা এ-রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবো...যদি ব্যর্থ হই তবে তা দেশের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে"।

বিশেষজ্ঞ মহল এখন এ-রোগের টিকা আবিষ্কার জরুরি বলে মনে করছেন, কারণ নিপাহ ভাইরাসবাহী বাদুড় দক্ষিণ-এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে প্রচুর দেখা যায়। থাইল্যান্ডে জীবন্ত নিপাহ ভাইরাস পাওয়া গেছে, যদিও সেখানে মানুষের মধ্যে কোনো সংক্রমণের খবর পাওয়া যায় নি। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে নিপাহজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে। হেমন্ত থেকে শীতকাল পর্যন্ত কাঁচা অবস্থায় অসিদ্ধ খেজুরের রস পান যেহেতু এসব অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, নিপাহজনিত রোগ প্রতিমৌসুমেই মহামারীর রূপ ধারণ করতে পারে, যা হবে জনস্বাস্থ্যের জন্য এক মারাত্মক হুমকি। প্রতিরোধমূলক টিকা আবিষ্কারের জন্য প্রথমে চাই নিরাপদে শরীরে প্রয়োগযোগ্য সঠিক ধরনের কিছু ভাইরাস। এ-বিষয়ে ড. স্টিভ লুবি বলেন, "আমরা এমন অনেক ধরনের বাদুড় পেয়েছি যাদের শরীরে এ-ভাইরাসের এন্টিবডি (প্রতিরোধক) রয়েছে। টিকার জন্য সঠিক ভাইরাস খুঁজে পাওয়াটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। বাদুড়েরা ভাইরাস বহন করেও কেন এ-রোগে সচরাচর আক্রান্ত হয় না তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড. স্টিভ লুবি বলেন, "বাদুড়েরা সাধারণত এই ভাইরাসের প্রতি সংবেদনশীল নয়, অতএব তারা প্রায়শই রোগমুক্ত থাকে; আমাদের পেটে বিদ্যমান *ইশকেরিশিয়া কোলাই* নামের জীবাণুর মতো এই ভাইরাসও তাদের শরীরে সয়ে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে: মা-বাদুড়ের শরীরে বিদ্যমান এন্টিবডি তাদের শাবকের দেহেও সঞ্চারিত হয়। কিন্তু কখনো কখনো এন্টিবডি ভাইরাসের কাছে পরাভূত হলে তারাও রোগাক্রান্ত হতে পারে।"

বাদুড়ের দেহের এই নিপাহ-প্রতিরোধী ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণভাবে জানতে পারার মাধ্যমেই একদিন মানুষের দেহে প্রয়োগযোগ্য নতুন টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি করা যাবে। এর আগে বর্তমান প্রতিরোধ ব্যবস্থাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

২ আপনার চারপাশেই জীবাণু: কোনটা শত্রু আর কোনটা বন্ধু চিনে নিন

জীবাণু নামের যে অতি ক্ষুদ্র জীবকণা আমাদের প্রতিবেশীর মতো পরিবেশের সর্বত্র বিদ্যমান সে-সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের কৌতুহলের শেষ নেই। অনেকেই জীবাণু বলতে কেবল রোগজীবাণু বুঝে থাকেন, যাদের সংক্রমণে আমরা নানারকম অসুখে আক্রান্ত হই। কিন্তু প্রকৃতিতে বিদ্যমান জীবাণুর শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ কিছুকিছু রোগের জন্য দায়ী, বাকি শতকরা পঁচানব্বই ভাগ জীবাণুই আমাদের পরম বন্ধু এবং মানুষসহ নানা প্রাণীর অষুধ ও খাদ্যদ্রব্য তৈরিতে, কৃষিকাজে, শিল্পে, শক্তি উৎপাদনে, জ্বালানী তেল, গ্যাস, লোহা, সোনা-রুপা, ইত্যাদি খনিজ পদার্থ আহরণে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। এ-বিষয়ে বাংলা ভাষায় লেখা ভালো বই নেই বলে অণুজীব বিজ্ঞান সম্পর্কে এ-দেশের সাধারণ মানুষ তেমন কিছুই জানে না। আইসিডিডিআর,বি সম্প্রতি সহজ বাংলা ভাষায় লেখা এমন একটি মূল্যবান বই প্রকাশ করেছে, যা পাঠ করলে অণুজীব বা জীবাণুবিজ্ঞানের মতো একটি কঠিন বিষয়েও যেকেউ জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবেন। বইটির শিরোনাম *জীবাণুর অদৃশ্য জগত: বন্ধু ও শত্রু অণুজীব পরিচিতি* এবং এর রচয়িতা আইসিডিডিআর,বি-র সিনিয়র বিজ্ঞানী ড. মুনীরুল আলম। অনেক কঠিন বিষয়কে সহজ বাংলায় প্রকাশ করে তিনি বলতে গেলে একটি অসাধ্য সাধন করেছেন। বইটি পড়লে অন্য অনেক কিছুর সাথে আপনি জানতে পারবেন:

- কোন কোন জীবাণু কী কী প্রক্রিয়ায় রোগ সৃষ্টি করে এবং কোন কোন জীবাণু আমাদের উপকার সাধন করে এবং কোনটি কী উপায়ে উপকার সাধন করে।
- কোন জীবাণু ব্যাকটেরিয়া শ্রেণীভুক্ত, কোনটি ভাইরাস শ্রেণীভুক্ত এবং এগুলো দেখতে কেমন।
- কিভাবে জীবাণু থেকেই জীবাণু-ধ্বংসকারী অষুধ (অ্যান্টিবায়োটিক) তৈরি করা হয়।
- জীবাণু-ধ্বংসকারী অ্যান্টিবায়োটিক কত প্রকার এবং কিভাবে এগুলোর কার্যকারিতা নির্ণয় করা হয়; যথেচ্ছ প্রয়োগের ফলে কিভাবে এদের কার্যকারিতা দিনে-দিনে নষ্ট হচ্ছে।
- কিভাবে অপরিচ্ছন্ন হাতের স্পর্শে, হাঁচি-কাশি, থুথু ও মশা-মাছির মাধ্যমে রোগ-জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং রোগ সৃষ্টি করে।
- দূষিত পানি পরিশোধনের সহজ উপায় কী কী।

উপমাসমৃদ্ধ সরল ভাষায় অনেক কঠিন বিষয় পাঠককে বুঝানোর ক্ষমতা লেখকের কতটুকু তা কিছু উদ্ধৃতির মাধ্যমে বুঝা যাবে। তিনি বইটির

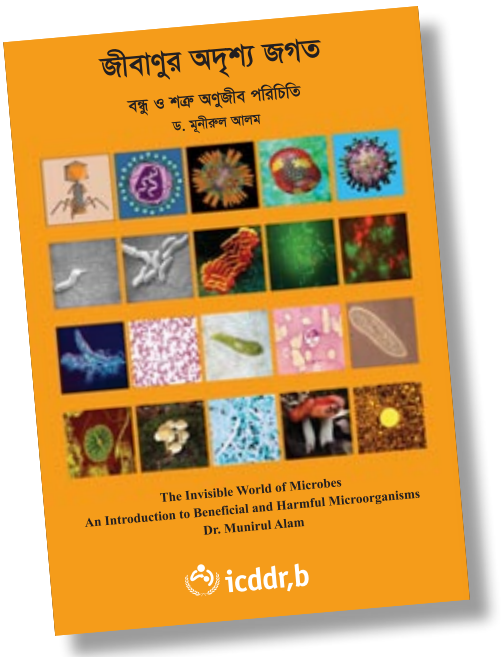

একাংশে লিখেছেন: "মানব বা প্রাণীদেহকে একটি দেশের সাথে তুলনা করা যায়। প্রত্যেকটি দেশের সীমান্তে যেমন রয়েছে সীমান্তরক্ষী এবং অভ্যন্তরে পুলিশ, সেনাবাহিনী, আনসার, নৌ ও বিমান বাহিনী, তেমনি মানুষ বা প্রাণীদেহেও রয়েছে বিশেষ বিশেষ ধরনের দেহরক্ষাকারী বাহিনী। একটি দেশের বিভিন্ন বাহিনীর যেমন রয়েছে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা বা দায়িত্ব, তেমনি মানব বা প্রাণীদেহের রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনীরও রয়েছে নিজস্ব কর্মপদ্ধতি ও বিশেষ ভূমিকা...বিভিন্ন সুযোগ-সন্ধানী অণুজীব বা জীবাণু দেহে প্রবেশ করে থাকে। আর তখনই দেহরক্ষাকারী রক্তকণিকাসমূহ নানা উপায়ে আক্রান্তকারী জীবাণুকে রুখে দিতে ও ধ্বংস করতে চেষ্টা করে। এছাড়াও, রক্তে অবস্থিত বিভিন্ন কণিকা জীবাণু-সংক্রান্ত তথ্য দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে পৌঁছে দেয়। ফলে, জীবাণু ধ্বংসকারী দেহরক্ষী বা প্রতিরোধকারী সৈন্য আক্রান্ত অংশে পৌঁছে যায় এবং শত্রুকে রোখার সব ধরনের চেষ্টা করে। তবে, এক্ষেত্রে কে জয়ী হবে তা নির্ভর করে দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর। যখন জীবাণু জয়ী হয় তখনই রোগ সৃষ্টি হয়। যখন দেহরক্ষীরা জয়ী হয় (বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটে) তখন মানবদেহ রোগমুক্ত থাকে। টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে মানবদেহের দেহরক্ষী রক্তকণিকাসমূহকে রোগজীবাণু সম্বন্ধে আগাম ধারণা দেয়া হয়। ফলে, প্রকৃত জীবাণু দেহে প্রবেশের সাথে সাথে তাকে সনাক্ত ও ধ্বংস করতে সমর্থ হয়"।

অন্যত্র লেখা হয়েছে: "সভ্যতার ক্রমবিকাশে এবং অর্থনীতিতে এরা [অণুজীবেরা] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে...অণুজীব বিজ্ঞান জীববিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যেখানে মানুষ খুঁজে পেয়েছে অত্যন্ত উপকারী বন্ধুকে এবং চিহ্নিত করতে পেরেছে তার বিপজ্জনক শত্রুকে। সমগ্র অণুজীবের শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ মানুষের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত

হয়েছে। বাকিরা সব উপকারী বন্ধু। অণুজীবসমূহ আমাদের কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা, পয়ঃনিষ্কাশন প্রভৃতি শাখাগুলোতে ব্যাপক অবদান রেখে চলছে, যা আমাদের অনেকেরই অজানা"। এরপর লেখক কোন জীবাণু কীভাবে আমাদের উপকার সাধন করছে তারও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

লক্ষ করা যায়: রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক কলেরা ও ডায়রিয়ার জীবাণুসমূহ এবং এইডস সৃষ্টিকারী ভাইরাসের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এর কারণও সুস্পষ্ট। বাংলাদেশে কলেরা ও ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে প্রায় প্রতিবছরই দু'বার করে। এ-দেশে খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও ব্যাপক ব্যবহারের ফলে যদিও এসব রোগে মৃত্যুহার আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে, লেখক এসব নিয়ে বেশি বাক্য ব্যয় করেছেন কারণ কীভাবে এসব প্রতিরোধ করা যায় সেসম্পর্কে গণসচেতনতা তৈরি করাটাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। একইভাবে এইডস এখন বাংলাদেশে বহুল-আলোচিত একটি স্বাস্থ্যসমস্যা, যা প্রতিরোধ করতে পারলে দেশ একটি ভয়াবহ রোগের মহামারী থেকে রক্ষা পেতে পারে।

নিঃসন্দেহে বলা যায়: এমন সহজ বাংলা ভাষায় রচিত অণুজীব বিজ্ঞান-বিষয়ক বই এটিই প্রথম। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস শ্রেণীভুক্ত অণুজীবের আণুবীক্ষণিক ছবির সমন্বয়ে বইটির প্রচ্ছদ তৈরি করেছেন লেখক নিজেই। ৭৮ পৃষ্ঠার বোর্ড-বাঁধাইকৃত চার-রঙে ছাপা অজস্র ছবিসম্বলিত এই বইটির বিক্রয়মূল্য ১৫০ টাকা মাত্র। তবে, যারা একসঙ্গে পাঁচ কপি কিংবা তার বেশি কিনবেন তারা শতকরা পঁচিশ ভাগ কমিশন পাবেন। আইসিডিডিআর,বি-র গ্রন্থাগার ভবনে অবস্থিত প্রকাশনা বিভাগে বইটি পাওয়া যাচ্ছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ৮৮৬০৫২৩-৩২ এক্সটেনশন ৩৫১৪ টেলিফোন নম্বরে হামিদা আক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।

বইটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরাসরি আইসিডিডিআর,বি-র হাসপাতাল কল্যাণ তহবিলে জমা হবে—অর্থাৎ মহাখালি ও মতলবের কলেরা হাসপাতালে যেসব রোগী, বিশেষত দরিদ্র শিশু ও মহিলা বিনামূল্যে চিকিৎসা পাচ্ছে, এই টাকা তাদের চিকিৎসার পেছনে খরচ করা হবে। তাই বইটি কিনে আপনিও এই দুঃস্থ মানবতার সেবায় গর্বিত অংশীদার হতে পারেন এবং রোগ-জীবাণুসহ সব শ্রেণীর অণুজীব সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। একই সঙ্গে রোগ-জীবাণুর গতি-প্রকৃতি এবং এদের সংক্রমণ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হয়ে আপনি নিজেকে ও আপনার পরিবারের সদস্যদেরকে প্রতিরোধযোগ্য অসুখ-বিসুখ থেকে রক্ষা করতে পারেন। তাছাড়া, এই বইটি পড়ার পর আপনার শিক্ষার্থী সন্তান ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, অণুজীব বিজ্ঞানের মতো অত্যাধুনিক বিষয় সম্পর্কে পড়াশুনা করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

এম করিম খান, কমিউনিটি বেইজড মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ
মোঃ ইকবাল, আইসিডিডিআর,বি

মুমূর্ষু অবস্থায় প্রয়োজনে রক্ত সঞ্চালন মানুষের জীবন বাঁচায়। আপনার দেওয়া রক্ত আপনার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী বা অপরিচিত কারো জীবন বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে। একজন মানুষ আর একজনকে নানা ধরনের গিফট দিয়ে থাকেন; সবচেয়ে ভালো গিফট-এর একটা হচ্ছে রক্ত দান।

বাংলাদেশে প্রতিবছর ৪,৫০,০০০ ব্যাগ রক্ত

দরকার। এই রক্তের প্রয়োজন হয় সড়ক দুর্ঘটনা বা অন্যভাবে আহত হয়ে কারো যদি প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় তাদের জন্য এবং অনেকের অপারেশনের সময় বা অপারেশন-পরবর্তী পর্যায়ে যদি রক্তের প্রয়োজন পড়ে। মারাত্মক রক্তশূন্যতা, থ্যালাসেমিয়া, জন্মগত হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, ক্যান্সার, ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বর, প্রসবকালীন জটিলতা, ইত্যাদি ক্ষেত্রেও রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন পড়ে।

বাংলাদেশে কতগুলো ব্লাড ব্যাংক আছে সম্ভবত সেসম্পর্কে কেউ সঠিক তথ্য দিতে পারবেন না। তবে, এই শত শত ব্লাড ব্যাংকের মধ্যে ৯৮টি ব্লাড ব্যাংক সরকারিভাবে স্বীকৃত। এদের মধ্যে কিছু সরকারি ও কিছু বেসরকারি। ১৮ বছর এবং তার বেশি বয়সের একজন সুস্থ মানুষ বছরে তিনবার রক্ত দিতে পারেন। তাতে রক্তদানকারীর কোনো ক্ষতি হয় না, বরং তারা নানাভাবে উপকৃত হন।

রক্ত যেমন জীবন বাঁচায়, তেমনি রক্ত জীবন কেড়েও নিতে পারে। তাই কারো রক্ত নেওয়ার আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া নিয়মাবলি মানা হয়েছে কি না তা দেখতে হবে। রক্তে এইচআইভি, সিফিলিস, ম্যালেরিয়া, হেপাটাইটিস বি কিংবা হেপাটাইটিস সি-র জীবাণু আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এধরনের পরীক্ষাগুলো এখন র‍্যাপিড টেস্ট কিট-এর মাধ্যমে সহজে করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়: বেশিরভাগ ব্লাড ব্যাংকে এগুলো করা হয় না। তাই জীবাণুযুক্ত রক্ত পরিসঞ্চালনের পর গ্রহীতার মধ্যে নানাধরনের জটিলতা দেখা দেয়।

আমাদের প্রয়োজনের প্রায় ৭০ ভাগ রক্তের জোগান দেয় পেশাদার রক্তদাতাগণ, যাদের অনেকের দেহে এইচআইভিসহ নানাধরনের জীবাণু বিদ্যমান। তাই কোনো অবস্থাতেই পেশাদার রক্তদাতার রক্ত প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ছাড়া ব্যবহার করবেন না। নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনে একে অন্যকে রক্ত দিন। গড়ে তুলুন নিজেদের মধ্যে আরো দৃঢ় বন্ধনের সংস্কৃতি।

আশার কথা: এ-বিষয়ে এখন আগের চেয়ে গণসচেতনতা অনেক বেড়েছে; অপেশাদার রক্তদাতার সংখ্যাও বাড়ছে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে বেশিরভাগ রক্তের জোগান দেয় সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা।

সন্ধানী, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, লিও ক্লাব—এমন আরো বহু সার্ভিস ক্লাব বহুদিন ধরে সুনামের সাথে মুমূর্ষু মানুষের জীবন বাঁচাতে স্বেচ্ছায় রক্ত দান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর ১৪ জুন 'বিশ্ব রক্তদান দিবস' পালিত হয়। এই দিনটি পালিত হয় রক্তের ABO গ্রুপের আবিষ্কারক কার্ল ল্যান্ডস্টিনার-এর জন্মদিনকে উপলক্ষ করে।

রক্ত দান একটা মহৎ কাজ। এ-কাজে নিজেদের স্বার্থেই আমাদের সবার এগিয়ে আসা উচিত। রক্ত দিন, জীবন বাঁচান।